Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

রাজা রামমোহন রায়ের দার্শনিক উপলব্ধির আলোকে মানবোত্তরণ : একটি সমীক্ষা

সুদীপ পাল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/28_Sudip-Pal.pdf

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকে বাংলার আকাশে যেসকল মনীষীগণ বাংলার এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাজা রামমোহন রায়। তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এক তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল যা মানব জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক অশুভ শক্তি সমাজব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তির আসনে বসে সমাজস্থ মানুষকে শোষণ, পীড়ন ও সীমাহীন অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলেছিল। তৎকালীন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ ধর্মাচরণের নামে নানা কুপ্রথা চালু করেছিলেন যা সমাজকে এক অজ্ঞান অন্ধকারে গভীরভাবে নিমজ্জিত করেছিল যার ফলে সমাজের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে বাংলার বুকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর ভর করে তিনি সমাজকে এক নতুন দিশা দেখান। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারে বন্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তাঁর জ্ঞানালোকের স্পর্শে অজ্ঞতার অন্ধকার কীভাবে দূরীভূত হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও এই নিবন্ধে আলোচিত হবে। রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত সদর্থক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে এক বিশেষ উদ্দীপনায় জাগরিত করেন। এই জাগরণের ঢেউ সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে আছড়ে পড়ে, যা মুক্তির এক নতুন দিককে উন্মোচিত করে সমগ্র মানব জাতিকে উত্তরণের পথে উত্তীর্ণ করার কাজটিকে ত্বরান্বিত করে। তিনি যেভাবে মুক্তি বিষয়ক আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার থেকে একথা স্পষ্ট যে তিনি মুক্তি বলতে কোনো তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক মুক্তি বোঝেননি, বরং মুক্তি আক্ষরিক অর্থেই মানবজাতির এক বদ্ধদশা থেকে উত্তরণকেই সূচিত করে — এই বক্তব্যই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি যেহেতু রাজা রামমোহন রায়ের দার্শনিক উপলব্ধির আলোকে মুক্তি তথা মানবোত্তরণ বিষয়ক সেহেতু তাঁর সংস্কারমুখী ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে দার্শনিক উপলব্ধিকে একাত্ম করে মানবোত্তরণের অন্তর্নিহিত ধারণাটির বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা হবে। তিনি কীভাবে তাঁর সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে জীবনকে সর্বোত্তম ভাবে পরিচালিত করে সমাজস্থ সকল মানুষকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনাও এই গবেষণামূলক নিবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে আলোচিত হবে।

সূচক শব্দ: কুসংস্কার, কুপ্রথা, মানবোত্তরণ, মুক্তি, আধ্যাত্মিকতা

রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় ছিল বাংলার নবজাগরণের যুগ। তাঁকে নবজাগরণের অগ্রদূত বলে আখ্যায়িত করা হয়। নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে আবির্ভাব হয়েছিল সেই সময়ে একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অপরদিকে বিভিন্ন কুপ্রথা, কুসংস্কার, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা সমাজ পরিচালিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজস্থ সকল মানুষের উত্তরণের জন্য আগে সমাজের সংস্কারের প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায় কীভাবে তাঁর সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে জীবনকে সর্বোত্তম ভাবে পরিচালিত করে সমাজস্থ সকল মানুষকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা আলোচিত হয়েছে।

তাঁর জীবনবোধ ও জীবনাদর্শের উপলব্ধ সত্যটি হলো প্রগতির ইতিহাস। শুধুমাত্র তত্ত্বকথার বৌদ্ধিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তাতে বাস্তবতা ও মানবতার মেলবন্ধনের অভাব থেকে যায়, তাতে প্রগতি বলতে কী বোঝানো হয় বা প্রগতির স্বরূপ কী সে সম্পর্কে একটা অস্পষ্টতা থেকেই যায়। একটা জাতির অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাওয়াকেও প্রগতি বলে, কিন্তু তাতে ওই জাতিটি একস্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরিত হতে পেরেছে তা বলা যায় না। একথা ঠিক যে, অর্থনৈতিক প্রগতিতে অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আর্থিক অভাব-অনটন দূর হয় কিন্তু তাতে সমাজের অগ্রগতি সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় একথা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক প্রগতিতে সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য হয়, এই ধনি-গরিবের বৈষম্য নিয়েও বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু যখন কিছু সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার ও নানাবিধ লোকাচার ধর্মের দোহাই দিয়ে মুক্তির নামে শোষণ-পীড়ন এমনকি নারকীয় হত্যালীলা পর্যন্ত অনুমোদন করে তখন সেই সমাজ প্রগতির পরিবর্তে বদ্ধদশাপ্রাপ্ত হয়। কোনো সমাজের সামাজিক প্রগতি নির্ভর করে সেই সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মানসিক প্রগতির উপর। আর মানসিক প্রগতি তখন সম্ভব যখন বাস্তব ও মানবতার যথাযথ মেলবন্ধন হয়, এবং যখন উভয়ের ভিত্তি হিসাবে অজ্ঞতা ও দুর্বলতার পরিবর্তে যৌক্তিকতা ও দৃঢ় মানসিকতাকে পুঁজি করে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়েছিল।

আধুনিক, যুক্তিবাদী ও মানবদরদী রামমোহন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আধুনিক যুগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা এবং বিভিন্ন কুসংস্কারে গভীরভাবে আচ্ছন্ন সমাজ এক অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল যার ফলশ্রুতি প্রগতির পরিবর্তে সমাজের পশ্চাদ গমন, অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া। সমাজস্থ সকল মানুষ যে এই অবস্থাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন তা নয়, কিন্তু এই পশ্চাদপদ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তৎকালীন কট্টরপন্থী হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আরো সুযোগ পান কুপ্রথা ও নানা লোকাচারকে হাতিয়ার করে সমাজের মূল চালিকা শক্তির আসনে বিরাজ করত। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হয় শোষণ-পীড়ন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় যুক্তিবাদী রামমোহনের উপস্থিতিতে এই অভাব দূরীভূত হয়। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদকে ভরসা করে ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ান একা। রামমোহনকে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে নিরন্তর আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। তিনি একটা সময় পারিবারিক সমর্থন টুকুও পাননি। তথাপি তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সামাজিক সংস্কারের পক্ষে এক বিশেষ পরিবর্তনের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন।

পৌত্তলিকতার বিরোধী এবং একেশ্বরবাদের পৃষ্ঠপোষক রামমোহন সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা পূর্বক সমাজব্যবস্থাকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর উপলব্ধিকে সমাজের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু উদারমনস্ক মানুষজনকে তাঁর পাশে পেতে চেয়েছিলেন যারা তাঁর মতোই সমাজস্থ মানুষের শুভচিন্তক হবেন। রামমোহন এই উদ্দেশ্যে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করলেন যা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। ভারতীয় সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে এই ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[১]

রামমোহন তৎকালীন সমাজের কাঠামো পরিবর্তনের জন্য যে সকল সামাজিক সংস্কার প্রয়োজনীয় বলে স্থির করেছিলেন তার মধ্যে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ছিল সর্বপ্রথম। তিনি লক্ষ করেন যে, তৎকালীন হিন্দুসমাজ ধর্মের নামে এক অমানবিক উল্লাসে উন্মত্ত ছিল যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় তার জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হতো। এই অমানবিক উল্লাসে উন্মত্ত তৎকালীন হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মৃত স্বামীর চিতায় তার জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার এই নারকীয় অত্যাচারকে সতীদাহ প্রথা নামে প্রচলন করেছিলেন। এই অমানবিক ঘটনা তাঁকে নিদারুণ ব্যথিত করেছিল, আর তাই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে লড়াইয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা।[২]

এই নৃশংস প্রথার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে একথা জানার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে দরবার করলেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন কেন তাঁরা এই সতীপ্রথার নামে এমন এক বিপদজনক এবং অমানবিক আচরণকে সমর্থন করেন। যে উত্তর তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে পান তাতে তিনি আরো ক্ষিপ্ত হন এবং এর প্রতিবাদ করে এই প্রথা রদ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই নৃশংস প্রথা সমর্থন ও প্রচলনের পক্ষে বলেছিলেন যে, যদি কোনো সদ্যবিধবা তার মৃত স্বামীর চিতায় নিজেকে আত্মহুতি দেয় তবে সে চিরমুক্তি পাবে, এবং যদি সে তা করতে অস্বীকার করে তাহলে সে পাপে পরিপূর্ণ হবে এবং কোনোভাবেই মুক্তি পাবে না। রামমোহন রায় এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন, এই প্রথা যে শুধুমাত্র ধর্মীয় কুসংস্কার সেকথা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি উত্থাপন করে তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে অত্যন্ত বিরাগভাজন হলেন, নানাবিধ বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। সোচ্চারে বললেন, বিধবাদের মৃত স্বামীর চিতায় নিজেকে পুড়িয়ে আত্মহুতি দেওয়ার মধ্যে কোনো পাপ-পুণ্য নেই, এটি একটি কুপ্রথা। তিনি এই প্রথা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ছিলেন কট্টরপন্থী এবং ধর্মান্ধ তাই রামমোহনের আহ্বান তাঁদের কর্ণগোচর হলো না। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তখন তিনি এই ধরনের বিপদজনক আচরণ নিষিদ্ধ করার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করতে উদ্যোগী হন।

পৈশাচিক সতীদাহ প্রথার বিপদজনক দিকটি তুলে ধরে তা যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অবিলম্বে বন্ধ করা বা নিষিদ্ধ করা উচিত বলে সর্বত্র এর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। এই প্রথা যে মূলত ধর্মীয় কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয় একথা যেন প্রমাণ করতে উদ্যোগী হন, তেমনি একথাও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে, জীবিত কোনো মানুষকে পুড়িয়ে মেরে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত করা যায়না। তাছাড়া এই নৃশংস প্রথা মুক্তিলাভের উপায়ও হতে পারেনা। তিনি নারীদের এই ধরণের বিপদজনক প্রথার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত আইনের দ্বারস্থ হন। তিনি সতীদাহ প্রথাকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেন এবং এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারস্থ হন। প্রথমে একটি চিঠির দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এই অমানবিক প্রথার বীভৎসতা সম্পর্কে তিনি অবগত করেন। এবং তারপর প্রথা বিলোপের পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন। তাঁর যুক্তি ছিল একটি সুস্থ ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদেই এই সতীদাহ প্রথা রদ করা প্রয়োজন।

তিনি যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের উপর ভর করে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই অমানবিক, পৈশাচিক সতীদাহ প্রথা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় বরং বিপদজনক। এই সময়কালে তিনি পারিবারিক সমর্থন না পেলেও কিছু প্রগতিশীল মানুষের সমর্থন পান, তাতে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা আরো বলিষ্ঠ হয়। রামমোহনের এই অমানবিক, পৈশাচিক সতীদাহ প্রথার বিরোধিতায় এবং এই প্রথা নিষিদ্ধ করার আবেদনে তৎকালীন সরকার তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোনো অন্যায় খুঁজে পাননি বরং রামমোহনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে সতীদাহ প্রথা অইনিভাবে রদ করেন।[৩]

রামমোহনের দৃঢ় মানসিকতা ও যৌক্তিক ভাবধারায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়। যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়। রামমোহনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এই সুসম্পর্কের সুবাদে সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ঘটনাবলী ও নানা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর তা প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় সচেষ্ট হন। তিনি ভারতবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা এবং পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অবগত করেন। ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক আইন পাশ করে ভারতবাসীদের ধর্ম এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণাসহ আর্থিক বন্দোবস্ত করে। প্রগতিশীল যুক্তিবাদীগণ এই আইনের সুফল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সেই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রগতিশীল যুক্তিবাদীগণ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজটিকে ত্বরান্বিত করেন। তবে আর একটি দিকও পরিলক্ষিত

হয়, তৎকালীন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কাছে এসকল প্রগতিমূলক কাজ মোটেও ভালো বলে মনে হয়নি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রগতিমূলক কাজগুলির বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তৎকালীন বাংলা তথা ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিরা খ্রিস্টধর্মের প্রচারের কাজটিকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁরা হিন্দুধর্মের বহু দেবতার পূজা অর্চনা ইত্যাদি দেখে হিন্দু ধর্মের নিন্দাও করেছিলেন। সমাজে তখন একদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং অপরদিকে খ্রিস্টান মিশনারি উভয়ই নিজ নিজ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু করেছেন। সমাজে প্রাধান্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উভয়েরই স্বার্থ ছিল, তাছাড়া এটাও লক্ষ করা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা রামমোহন রায়কে দমিয়ে রাখার চেষ্টাও হচ্ছিল। রামমোহনের একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সেকারণে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচারণ ও মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ এবং উদারমনস্ক, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। এর জন্য তাঁকে বহু ক্ষেত্রে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। এসময় তিনি পারিবারিক সমর্থন লাভেও খুব বেশি সমর্থ হননি। তা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সামাজিক সংস্কারের পক্ষে, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন।[৪]

এপ্রসঙ্গো বলা যেতে পারে তিনি যেমন পাশ্চত্য উন্মুক্ত যুক্তিবাদকে ভরসা করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে একেশ্বরবাদের প্রচার করে সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে হিন্দু শাস্ত্রের সারতত্ত্ব নিহিত রয়েছে বেদান্তদর্শনে, একারণে তিনি বেদান্তদর্শনের মূল ভাষ্য মানুষের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। 'একেশ্বরবাদের পৃষ্টপোষক রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে হিন্দুধর্মের বহু মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন, তাতে তিনি দমে যাননি, বরং তাঁর আধুনিক যুক্তিবাদী মানসিকতাকে পাথেয় করে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তর্কসভায় আহবান করেছেন। এটাও পরিলক্ষিত হয় যে, শুধুমাত্র হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামমোহনের বিরোধিতা করেছিলেন এমন নয়, ধর্মান্ধ ও সুযোগসন্ধানী খ্রিস্টান মিশনারিরাও রামমোহনকে শত্রু ভাবতে শুরু করেন।[৫]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে, রামমোহন তাঁর সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে এবং যুক্তিবাদের উপর ভর করে দৃঢ় ভাবে তাদের বিরোধিতা করে এদের হাত থেকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ তথা সমাজস্থ সকল মানুষকে নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তির এক নতুন স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ করে দিলেন। একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে, রাজা রামমোহন রায় এমন ভাবে নানাবিধ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন যার দ্বারা পরবর্তীকালের সংস্কারকদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রথ-প্রদর্শক এবং সংস্কারমুখী আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনের অগ্রদূত। ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা বিশ্ববাসীর কাছে ভারতবর্ষের অহংকার। তাঁর হাত ধরে যে সমাজ সংস্কার হয়েছিল তা মানুষকে মুক্তির এক নতুন স্বাদ দিয়েছিল। তিনি যে সংস্কারমুখী পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তা মোক্ষ বা পরম পুরুযার্থ প্রাপ্তিসূচক নয় বরং মানুষের জীবনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে অতিক্রমণ। তাই এই মুক্তিকে শুধুমাত্র মুক্তি না বলে উত্তরণ বলায় শ্রেয়। সুতরাং তাঁর হাত ধরে যে সমাজ সংস্কার হয়েছিল তা মানুষের মুক্তির তথা মানবোত্তরণের পথকে প্রসস্থ করেছিল।

তথ্যসূত্র:

১. 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ', সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ. ৫৪-৫৯
২. 'বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ', পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১১১-১১৫
৩. 'রামমোহন সমীক্ষা', দীলিপকুমার বিশ্বাস, পৃ. ৩৪২- ৩৪৬
৪. 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৪
৫. ওই, পৃ. ১৫

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অজিতকুমার ঘোষ সম্পা., ‘রামমোহন রচনাবলী’, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩

২. কেশবচন্দ্র চৌধুরী, ‘রামমোহন রায়’, কলকাতা, সিটী বুক সোসাইটী, ১৯০৮

৩. দিলীপকুমার বিশ্বাস, ‘রামমোহন সমীক্ষা’, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৩

৪. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত’, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪২৬

৫. নরহরি কবিরাজ সম্পা., ‘উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক’, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৯

৬. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ‘রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ’, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১১

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ‘বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৩

৮. বিনয় ঘোষ, ‘বাংলার নবজাগৃতি’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৩৫৫

৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, ‘মুক্তির সন্ধানে ভারত’, কলকাতা, দি মর্ডাণ পাবলিশার্স, ১৩৫২

১০. শিবনারায়ণ রায় সম্পা., ‘রামমোহন: অন্ধকারের উৎস হতে’, কলকাতা, ইউনিমেজ, ২০১৯

১১. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ‘বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তা রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ’, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮

১২. সুশীলকুমার গুপ্ত, ‘ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ’, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৯৫৯

লেখক পরিচিতি: সুদীপ পাল, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, কুলটি কলেজ, কুলটি, পশ্চিমবঙ্গ।